



ଅଧ୍ୟାୟ ୪

ଉଦ୍‌ଦ୍ଦିଦ, ପ୍ରାଣୀ ଓ ଅନୁଜୀବ

সর্থ্যায়

৪

উডিদ, প্রাণী ও অণুজীব

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা নিচের বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পারবে—

- ✓ জীবজগতকে সাধারণ পর্যবেক্ষণযোগ্য বৈশিষ্ট্য এবং মিল-অমিলের ভিত্তিতে বিভিন্ন দলে ভাগ করা হয়; যেমন: অণুজীব, উডিদ এবং প্রাণী।
- ✓ ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাকের সাধারণ তুলনামূলক আলোচনা (গঠন, বৃদ্ধি, উপকারিতা, অপকারিতা)



জীব জগতের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য উডিদ। শুধু খাবারের উৎস হিসেবেই নয়, বরং পৃথিবীর পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য উডিদ অপরিহার্য। উডিদ বিচ্ছিন্ন রকমের হয়। কিন্তু সকল উডিদের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এখানে আমরা উডিদ সম্পর্কে একটু বিস্তারিত জেনে নেবো।

উডিদ হচ্ছে মূল, কাণ্ড ও পাতা আছে এমন জীব যা সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে পানি ও কার্বন ডাই-অক্সাইড ব্যবহার করে শর্করা জাতীয় উপাদান তৈরি করে। এই প্রক্রিয়ায় যে অক্সিজেন তৈরি হয়, তা উডিদ পরিবেশে ছেড়ে দেয় যা এই পৃথিবীকে মানুষসহ অন্য প্রাণীর জন্য বাসযোগ্য রেখেছে।

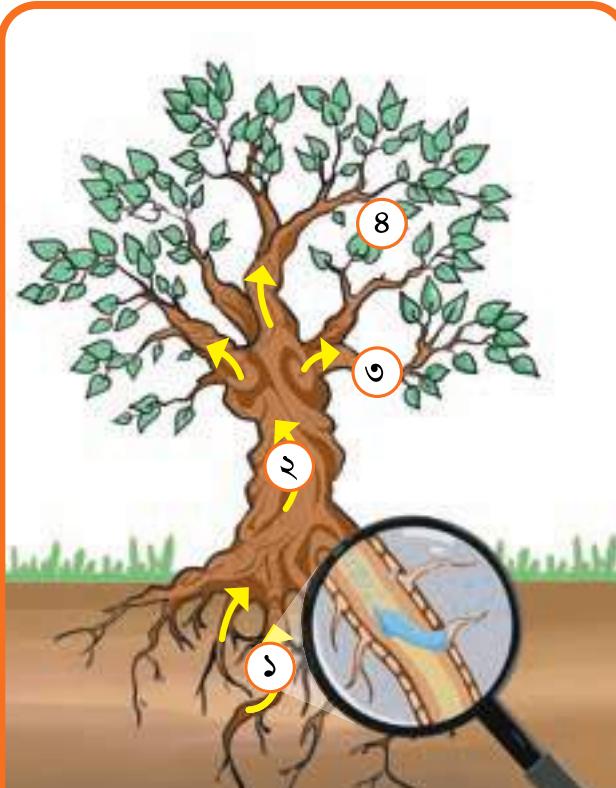
উডিদের মূল ও কাণ্ড কেন প্রয়োজন?

উঁচু দালানের কথা ভেবে দেখো। পানি এক ধরনের নলের মাঝে দিয়ে দালানের বিভিন্ন তলার নানা অংশে যায়। ঠিক একই রকম পরিবহন ব্যবস্থা থাকে সংবাহী উডিদ শরীরে। সংবাহী (vascular) উডিদ বলতে পরিবহন টিস্যু আছে এমন গাছ বোঝায়। এসব গাছ মূল দিয়ে মাটি থেকে পানি নেয়। এই পানি কাণ্ডের মধ্য দিয়ে উঁচু শাখা-প্রশাখা ও অন্যান্য অঙ্গে যায়। একাজে জাইলেম



ছবি: উডিদের কাণ্ডের টিস্যুবিন্যাস

(Xylem) টিস্যু ব্যবহার করা হয়। জাইলেম দিয়ে গাছ পানির পাশাপাশি খনিজ লবণ নেয় মাটি থেকে। অন্যদিকে পাতায় তৈরি খাদ্য মূলসহ অন্যান্য অঙ্গে নিয়ে যাওয়ায় যুক্ত পরিবহন নলের নাম ফ্লোয়েম (Phloem)। এই জাইলেম ও ফ্লোয়েমের মাঝে থাকে ক্যাম্বিয়াম (Cambium) স্তর, যা এই দুই রকমের পরিবাহী টিস্যুকে পরস্পর থেকে আলাদা করে। গাছের মূল ও কাণ্ডের আবরণের ভেতরে থাকে করটেক্স (Cortex)। একটা গাছকে কাঠামো দিয়ে তার পাতা ধারণের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে এই গাছের কাণ্ড। এই কাণ্ড আবার গাছভেদে কিংবা অঙ্গভেদে বিভিন্ন রকম হতে পারে। ফুলের বোঁটা হিসেবে আমরা যা দেখে থাকি তা মূলত এক ধরনের নরম কাণ্ড। কাঠ হিসেবে ব্যবহার উপযোগী কাণ্ড খুব শক্ত হয় এবং এর বাইরের পুরু বাকলের জন্য। মজাদার পানীয় আবেদনের রস পাই আমরা আবেদনের রসালো কাণ্ডে সঞ্চিত খাদ্য থেকে। আবার, কাঁটাযুক্ত ক্যাষ্টাস তাদের কাণ্ডে পানি সঞ্চয়ের কাজে ব্যবহার করে।



যেভাবে বিভিন্ন উপাদান গাছের মধ্যে পরিবাহিত হয়-

- ১। মাটি থেকে পানি ও খনিজ উপাদান গাছের মূলরোমে প্রবেশ করে। এরপর করটেক্স টিস্যু হয়ে জাইলেম নামক পরিবহন টিস্যুতে যায়।
- ২। প্রস্তেবন টানে পানি ও খনিজ উপাদান মূল থেকে কাণ্ড হয়ে পাতায় আসে।
- ৩। পাতায় আসা উপাদানসমূহ পাতার প্রত্যেক কোষে প্রবেশ করে।
- ৪। পানি ও বাতাস থেকে নেয়া কার্বন ডাই অক্সাইড ব্যবহার করে পাতার কোষগুলো শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করে।

মূল

গাছের যে অংশ মাটির সাথে যুক্ত থাকে, খাদ্য জমা রাখে, মাটি থেকে পানি ও খনিজ পুষ্টি উপাদান সংগ্রহ করে তা মূল বা শিকড় (Root) নামে পরিচিত। মূলের গায়ে থাকে মূলরোম (Root hair) নামক ছোট চুলের মতো অংশ। মূলরোমের গঠন এমন থাকে যাতে খুব সহজেই বেশি পরিমাণে মাটি থেকে পানি ও দ্রবীভূত খনিজ লবণ শোষণ করে নিতে পারে। প্রত্যেক মূলের আগায় থাকে মূলচূপি (Root cap)। এটি মূলত কোষের শক্ত আবরণ যা মূলকে আঘাত থেকে রক্ষা করে। মূলের যে অংশ মাটির গভীরে প্রবেশ করে তা হলো প্রধান মূল। আবার ভূপৃষ্ঠালের কাছাকাছি শাখামূল বিস্তৃত থাকে। এরা পানি শোষণের জন্য সুবিশাল নেটওয়ার্ক তৈরি করে। মাটি থেকে পানি মূলে প্রবেশের পর মূল কোষে সৃষ্টি তরল

চাপের প্রভাবে পানি কাণ্ডের মধ্য দিয়ে পাতার দিকে যেতে থাকে। আবার, প্রস্তেবন প্রক্রিয়ায় গাছ পাতা থেকে পানি পত্ররক্ত দিয়ে পরিবেশে ছেড়ে দেয়। এভাবে পানি হ্রাসের ফলে তৈরি হওয়া পানিশূন্যতা পূরণে মূল থেকে জাইলেমের মাধ্যমে পানি উপরে উঠতে থাকে।



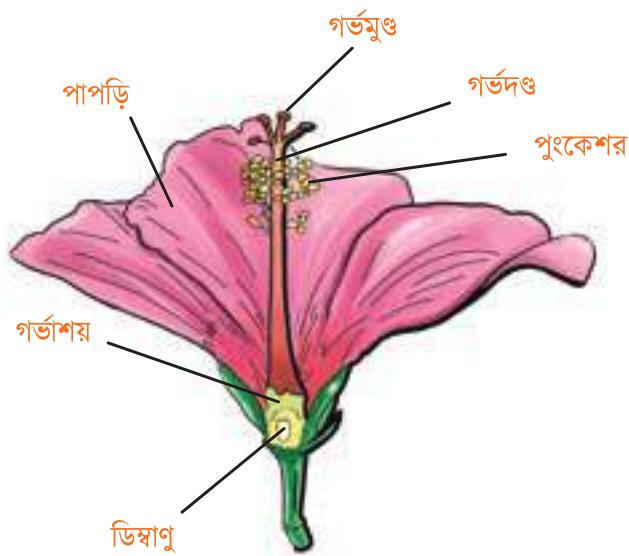
পাতা

একটি উদ্ভিদের দিকে তাকালে যে দিকে সবচেয়ে বেশি চোখ পড়ে তা হচ্ছে পাতা। বিভিন্ন রঙের, আকার-আকৃতির পাতা রয়েছে। আম, কাঁঠাল, জাম, বট প্রভৃতি গাছে একক ও সরল পাতা দেখা যায়। গোলাপ, নিম, সজনে প্রভৃতি গাছের পাতায় ছোট ছোট পত্রফলক (Lamina) থাকে। এদের যৌগিক পাতা বলে। কিছু গাছের পাতা সুঁচের মতো চিকন কিংবা কারো ক্ষেত্রে কাঁটাযুক্ত থাকে। পাতার বাইরের আবরণ হলো ত্বকীয় বহিস্তর বা এপিডার্মিস (Epidermis)। একে ঘিরে থাকে কিউটিকুল (Cuticle) নামক মোম-জাতীয় আবরণ। চিরহরিৎ জাতীয় গাছ, যেমন—পাইন গাছে সারা বছর সবুজ পাতা থাকে। পাতার কিউটিকুল খুব ঠাণ্ডা বা শুষ্ক আবহাওয়ায় পাতা থেকে অতিরিক্ত পানির বের হওয়া রোধ করে। পাতার নিচের পৃষ্ঠে পত্ররক্ত (stomata) নামক ছোট ছোট ছিদ্র থাকে। এসব ছিদ্রকে ঘিরে থাকে রক্ষীকোষ (guard cell), যারা গাছ থেকে জলীয়বাস্প ও বায়ুর নির্গমনকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। যখন গাছে পর্যাপ্ত পানি থাকে, রক্ষীকোষ স্ফীত হয়ে পত্ররক্তের মুখ খুলে যায়। পরিবেশের তাপমাত্রা বেড়ে গেলে পানি হ্রাস করানোর জন্য পত্ররক্তের মুখ বন্ধ হয়ে যায়। প্রস্তেবনের জন্য গাছ অতিরিক্ত পানি হারায়। মূল দিয়ে শোষিত পানির শতকরা প্রায় ৯৯ ভাগই প্রস্তেবনের মাধ্যমে পরিবেশে ফিরে আসে।



সালোকসংশ্লেষণ

অধিকাংশ উদ্ভিদের বড় বড় চ্যাপ্টা পাতা থাকে যেগুলোর মাধ্যমে তারা সূর্যের আলো শোষণ করে। এই সূর্যের আলো ব্যবহার করে যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভিদ নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করে তাকে সালোকসংশ্লেষণ (Photosynthesis) বলে। সালোকসংশ্লেষণ গাছের পাতায় হয়। সূর্যের আলো ছাড়াও পানি, খনিজ লবণ এবং কার্বন ডাই অক্সাইড এর প্রয়োজন সালোকসংশ্লেষণ করার জন্য। গাছের শিকড় এবং কাণ্ড এসব উপাদান সংগ্রহ করে। গাছ পত্ররস্ত্রের মাধ্যমে বায়ু থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে। উদ্ভিদ কোষের ক্লোরোপ্লাস্ট (Chloroplast) নামক অঙ্গাঙুতে সালোকসংশ্লেষণ ঘটে। কার্বন ডাই অক্সাইড, পানি ও সৌরশক্তি ব্যবহার করে ক্লোরোপ্লাস্ট ফ্লুকোজ রূপে গাছের খাদ্য তৈরি করে থাকে। সালোকসংশ্লেষণের প্রক্রিয়ার কারণেই অক্সিজেন তৈরি হয়। এই অক্সিজেন গাছ দ্রুত পরিবেশে ছেড়ে দেয়। তৈরিকৃত ফ্লুকোজের কিছু অংশ গাছের পাতায় সংযোগ থাকলেও অধিকাংশই ফ্লোয়েমের মাধ্যমে কাণ্ড ও মূলে চলে যায় এবং সেখানেই জমা থাকে। যেসব পশুপাখিরা গাছ, গাছের পাতা কিংবা ফল থেয়ে থাকে, তারা এসবে বিদ্যমান ফ্লুকোজ থেকে শক্তি পায়।



চিত্র: ফুলের বিভিন্ন অংশ

উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধি

সকল জীবেরই প্রজনন ঘটে। প্রজনন হলো বংশবৃদ্ধি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমেই একই প্রজাতির নতুন নতুন বংশধর সৃষ্টি হয়। প্রজনন বিভিন্নভাবে হতে পারে। যৌন প্রজননে পুঁঁ ও স্ত্রী জনন কোষের মিলনের নতুন সদস্য তৈরি হয়। আবার, অযৌন প্রজননে শুধু এক ধরনের কোষ থেকে নতুন বংশধর তৈরি হয়। কোনো কোনো উদ্ভিদ, প্রাণী কিংবা অণুজীবে উভয় ধরনের প্রজনন দেখা যায়।

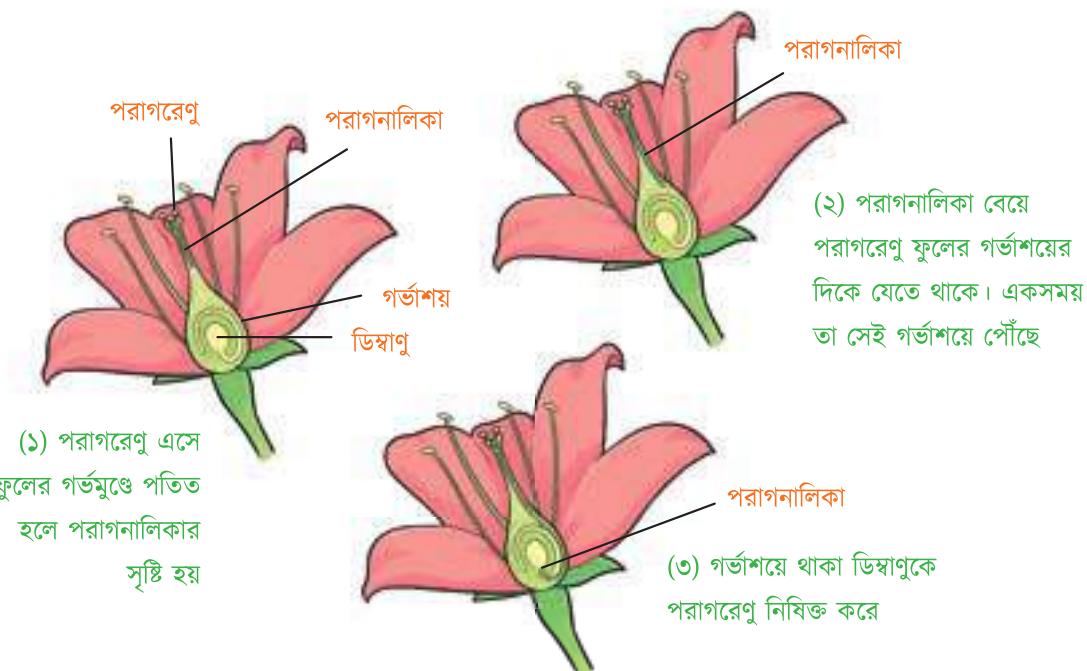
বীজযুক্ত উদ্ভিদ

বীজ হলো উদ্ভিদের জীবনচক্রে তৈরি এমন একটি গঠন যা নতুন চারা গাছের জন্ম দিতে পারে। বীজে খাদ্য জমা থাকে। উপর্যুক্ত পরিবেশে বীজ থেকে নতুন গাছ বেড়ে ওঠে।

কখনো কী ভেবে দেখেছ বীজ কীভাবে তৈরি হয়?

নিচের ছবিটি ভালোভাবে লক্ষ করো। এতে বীজ সৃষ্টির প্রক্রিয়া দেখানো হয়েছে। বীজযুক্ত গাছের যৌন প্রজনন ঘটে থাকে। গাছের পুঁজনন কোষ বা পরাগরেণু (Pollen) মিলন ঘটে স্ত্রী জনন কোষের ডিস্বাগুর (Egg cell) সাথে। ফুলের পরাগধানীতে পরাগরেণু আর গর্ভাশয়ে ডিস্বাগু সৃষ্টি হয়। গর্ভদণ্ডের নিচেই গর্ভাশয় থাকে। পরাগধানী থেকে পরাগরেণু বাতাস, মৌমাছি কিংবা অন্য কোনো মাধ্যমে ফুলের গর্ভমুণ্ডে যে প্রক্রিয়ায় যায়, তাকে পরাগায়ন (Pollination) বলে। পরাগায়নের ফলেই ডিস্বাগুর সাথে পরাগরেণুর মিলন ঘটে। যখন একই ফুলের কিংবা একই গাছের ভিন্ন ফুলের মধ্যে পরাগায়ন ঘটে তাকে স্ব-পরাগায়ন বলে। আবার, দুইটি ভিন্ন গাছের ফুলের মধ্যে পরাগায়ন ঘটলে তাকে পর-পরাগায়ন বলে। ফুলের মাঝে পরাগরেণু আদান-প্রদানে নিযুক্ত থাকা মাধ্যমকে পরাগরেণু বাহক বলে, যেমন- পাখি, কীটপতঙ্গ, বায়ু কিংবা পানি।

পরাগরেণু এসে পরাগমুণ্ডে পতিত হলে পরাগনালিকার সৃষ্টি হয়। এই নালিকা বেয়ে পরাগরেণু নিচে গর্ভাশয়ের দিকে যেতে থাকে। একসময় সেই গর্ভাশয়ে থাকা ডিস্বাগুর সাথে মিলিত হয়। এই মিলন প্রক্রিয়া নিষেক (Fertilization) নামে পরিচিত। নিষিক্ত ডিস্বাগু থেকে ফল এবং বীজ তৈরি হয়।



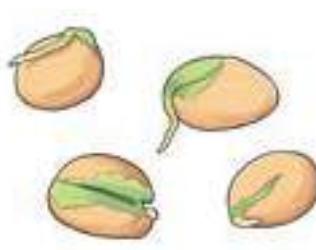
ছবি: নিষেক

বীজস্থীন ফলের উত্তিদি

কিছু কিছু উত্তিদের ফলে বীজ তৈরি হয় না। এসব ক্ষেত্রে স্পোরের (Spore) মাধ্যমে গাছের বংশবৃক্ষি ঘটে। স্পোর হলো এক বিশেষ ধরনের ছোট কোষ। স্পোর ক্যাপসুলের (Spore capsule) ভেতরে স্পোর সৃষ্টি হয়। সংবাহী টিসুহাইন উত্তিদি, যেমন- শ্যাওলার প্রজনন স্পোরের মাধ্যমে ঘটে। আবার কিছু কিছু সংবাহী টিসুযুক্ত উত্তিদেও প্রজননে স্পোরের ব্যবহার দেখা যায়।

বীজের ভিন্নতা

বীজের আবরণ থাকার উপর ভিত্তি করে উত্তিদেকে আবৃতবীজী (Angiosperm) ও অনাবৃতবীজী (Gymnosperm)- এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। আবৃতবীজী উত্তিদের বিস্তার ফুলের উপর নির্ভরশীল হলোও অনাবৃতবীজী উত্তিদের ক্ষেত্রে তা নয়। অনাবৃতবীজী উত্তিদের বীজ কোণের (Cone) মধ্যে তৈরি হয়, যেমন পাইন গাছের বীজ। অনাবৃতবীজী উত্তিদি হলো প্রাচীনতম উত্তিদি। যখন পৃথিবীতে ডাইনোসর ছিল, তখন স্তলজ উত্তিদের মধ্যে অনাবৃতবীজী উত্তিদি ছিল প্রধান। এই উত্তিদণ্ডের পৃথিবীতে আবির্ভাব প্রায় ২৫০ মিলিয়ন বছর পূর্বে হয়েছে। এ সময়ের প্রায় ১০০ মিলিয়ন বছর পরেও আবৃতবীজী উত্তিদের আবির্ভাব ঘটেনি। কিছু কিছু অনাবৃতবীজী উত্তিদি আকারে অনেক ছোট হয়। বাকিরা অনেক বড় উত্তিদে পরিণত হয়।



ছবি: কাঁঠালের বিচি

উত্তিদের খাদ্য মঞ্চয়

বাজারে গেলে ফল এবং সবজির দিকে খেয়াল করে দেখো। সব ফল এবং সবজি উত্তিদি থেকে আসে, যারা সূর্যের আলোর শক্তি (আলো এক ধরনের শক্তি)। শক্তির নানা রূপ রয়েছে, যেমন- শব্দ, তাপ, বিদ্যুৎ ইত্যাদি) খাদ্য হিসেবে জমা করে। মিষ্টি আলু এবং গজর তাদের মূলে খাদ্য সঞ্চয় করে, যা

আমরা খেয়ে থাকি। আলু, আখ এবং আদা তাদের

কাণ্ডে খাদ্য সঞ্চয় করে। যখন মানুষ

এক কাপ চা পান করে অথবা

পালংশাক বা বাঁধাকপি

জাতীয় সবজি খায়,

তখন তারা মূলত

পাতা খায়,

চায়ের



ক্ষেত্রে পাতার নির্যাস। ফুলকপি এবং ব্রকলি হলো মূলত ফুল যেগুলো আমরা খাই। এমনকি বীজও আমরা খেয়ে থাকি। যেমন- শিমের বীজ, চাল, বাদাম। উড়িদের বীজ অনেক পুষ্টি সম্পন্ন হয়, কারণ বীজের মধ্যে খাদ্য সঞ্চিত থাকে।

প্রাণী



তুমি কি কখনো চিড়িয়াখানায় গিয়েছ? যদি নাও যেয়ে থাকো তাহলে একটু ভেবে দেখো তো, তোমার প্রিয় প্রাণী কোনটি? এসব প্রাণীদের ভেতরে কি বিশেষ কোনো পার্থক্য চোখে পড়ে?

মেরুদণ্ডী প্রাণী

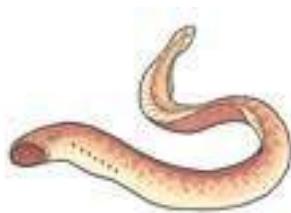
পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে তাদের ভেতর রয়েছে নানা বৈচিত্র্য। যেমন—তোমার পোষা বিড়ালটির একটা শক্ত শিরদাঁড়া বা মেরুদণ্ড রয়েছে। তোমারও পিঠের মাঝ বরাবর একটি মেরুদণ্ড রয়েছে, যা তোমাকে সোজা হয়ে চলতে সহযোগিতা করে। আবার অনেক প্রাণী আছে যাদের এমন গঠন নেই। যেমন- কেঁচো। নিচয়ই দেখে থাকবে কেঁচো কীভাবে বুকে ভর দিয়ে চলে। মেরুদণ্ডী প্রাণীরা হচ্ছে সেসব প্রাণী যাদের শরীরে বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত একটি মেরুদণ্ড থাকে। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের সাতটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। স্থল পরিবেশ ও সমুদ্রের বৃহত্তম প্রাণীরাও এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।



মেরুদণ্ডী প্রাণীর শ্রেণিবিভাগ

মেরুদণ্ডী প্রাণী হলো মেরুরজ্জু (Nerve cord) যুক্ত প্রাণী। এটি তাদের পিঠ বরাবর নিচের দিকে নেমে আসে। এসব প্রাণী মূলত কর্ডেট নামে পরিচিত। মেরুদণ্ড মেরুরজ্জুকে রক্ষা করে। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের সুরক্ষা এবং চলাচলের জন্য অস্তঃকঙ্কাল (Endoskeleton) থাকে। এই অস্তঃকঙ্কাল হাড় (Bones) ও তরুণাস্থি (Cartilage) দিয়ে তৈরি। তরুণাস্থি হলো নরম, হাড়ের মতো উপাদান যা প্রাণীর সাথে বৃদ্ধি পায়। মেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে রয়েছে সরীসৃপ, উভচর, পাখি এবং স্তন্যপায়ী প্রাণী। কিছু স্তন্যপায়ী প্রাণী হলো চার পা (Tetrapod) বিশিষ্ট প্রাণী, যেমন: গরু, ছাগল, বিড়াল, কুকুর ইত্যাদি। অন্যরা দুই পা (Bipod) বিশিষ্ট প্রাণী, যেমন—মানুষ। বিভিন্ন ধরনের মাছ মেরুদণ্ডী প্রাণীর শ্রেণিগুলোকে পরিপূর্ণ করে।

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের সাতটি শ্রেণি

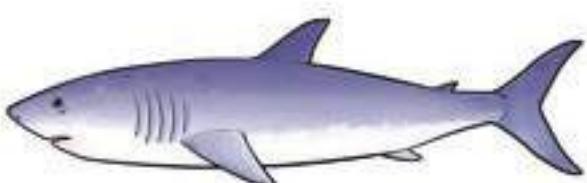
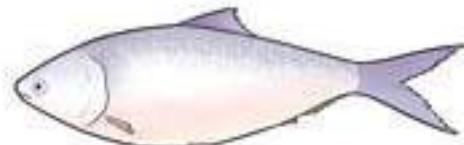


১) চোয়ালবিহীন মাছ

প্রায় ৭০টি মাছের প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে যাদের চোয়াল নেই। এদের মাঝে হাগফিশ ও ল্যাম্পে অন্যতম। ফুলকাযুক্ত এসব মাছের কঙ্কাল অত্যন্ত নমনীয় হয়।

২) অস্থিযুক্ত মাছ

প্রায় ২০,০০০ প্রজাতির মাছ আছে যাদের সুগঠিত কঙ্কাল থাকে, যার গঠন অস্থির মতো। শক্ত অস্থিবিশিষ্ট কঙ্কালের এসব মাছ শ্বসনের জন্য ফুলকা ব্যবহার করে। এই শ্রেণির উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো রংই, ইলিশ ইত্যাদি।



৩) তরুণাস্থিযুক্ত মাছ

কোমল তরুণাস্থি নিয়ে স্টিং রে, করাত মাছ ও নানা জাতের হাঙরের কঙ্কাল গঠিত হয়। এদেরও শ্বসনের জন্য সুগঠিত ফুলকা থাকে। তরুণাস্থিযুক্ত মাছের প্রায় ৭৫০টি প্রজাতি রয়েছে।

৪) উভচর প্রাণী

জল ও স্তল উভয় পরিবেশে বসবাস করার জন্য উভচর প্রাণীদের বিশেষ দেহ গঠন থাকে। তরুণ বয়সে এরা পানিতে থাকার সময় ফুলকা দিয়ে শ্বসন কাজ চালালেও পরিণত বয়সে স্তলে বাস করার সময় ফুসফুস দিয়ে চালায়। এসব প্রাণীর শক্ত চোয়াল, মসৃণ ত্বক ও অস্থিযুক্ত কঙ্কাল থাকে। প্রায় ৪৭০০ প্রজাতির উভচর প্রাণীর মধ্যে ব্যাঙ, স্যালামেন্ডার বহুল পরিচিত।





৫) সরীসৃপ

সরীসৃপের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এরা বুকে ভর দিয়ে চলাফেরা করে। টিকটিকি, গিরগিটি, কুমির, কচ্ছপ, সাপসহ প্রায় ৮০০০ প্রজাতির সরীসৃপ পাওয়া যায়। কিছু সরীসৃপ জলে বাস করে। আবার কিছু স্থলে বাস করে। এদের সুগঠিত ফুসফুস থাকে। আঁশযুক্ত ত্বকের আবরণে শক্ত অস্থিযুক্ত কঙ্কাল থাকে।



৬) পাখি

প্রায় ৯৭০০ প্রজাতির পাখি পাওয়া গিয়েছে। অধিকাংশ পাখিই উড়তে পারে, ব্যতিক্রম উটপাখি। ফাঁপা অস্থিযুক্ত কঙ্কালের জন্য পাখিরা বেশ হালকা হয়। পালকযুক্ত ডানার সাহায্যে এরা উড়তে পারে। পাখিদের ফুসফুস থাকে। আমাদের অতিপরিচিত পাখিদের মাঝে উল্লেখযোগ্য হলো কাক, চুই, করুতর, দোয়েল, টেগল প্রভৃতি।



৭) স্তন্যপায়ী

মানুষ, কুকুর, বিড়াল, হাতি, ঘোড়া, বাঘ, ভাল্লুক, জলহস্তীসহ বেশিরভাগ স্তন্যপায়ী প্রাণী স্থলে বাস করে। কিন্তু তিমি স্তন্যপায়ী হয়েও সমুদ্রে থাকে। স্তন্যপায়ীরা শিশুকালে মাঝের দুধ পান করে। এরা সবচেয়ে উন্নত বৈশিষ্ট্যের হয়ে থাকে। এদের দেহ লোমশ হয়। অস্থিযুক্ত কঙ্কাল এদের দেহ গঠন করে। সুগঠিত চোয়ালের জন্য এরা নানা ধরনের খাবার খেতে পারে। এ পর্যন্ত প্রায় ৪৭০০টি স্তন্যপায়ী প্রাণীর প্রজাতি শনাক্ত হয়েছে।

অমেরুদণ্ডী প্রাণী

সহজ কথায় বলা যায়—যাদের মেরুদণ্ড থাকে না তারাই অমেরুদণ্ডী প্রাণী। মেরুদণ্ডী প্রাণীরা সকল পরিবেশে বিস্তৃত হলেও এদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি নয়। সমস্ত প্রাণীর ৯৫ শতাংশেরও বেশি অমেরুদণ্ডী বা মেরুদণ্ডহীন প্রাণী। অমেরুদণ্ডী প্রাণীরা নানা পরিবেশে বাস করে। মরুভূমিতে, সমুদ্রের তলদেশে এবং এমনকি অন্যান্য জীবের ভিতরেও এদের পাওয়া যায়। আর্থোপড (Arthropod) হলো অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের বৃহত্তম দল, যাদের ১০ লক্ষেরও বেশি প্রজাতি রয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে কীটপতঙ্গ, মাকড়সা, কাঁকড়া, চিংড়ি, প্রভৃতি। চ্যাপ্টাকৃমি ও গোলকৃমি পানিতে, স্যাঁতসেঁতে মাটিতে বা অন্যান্য প্রাণীর ভিতরে বাস করে। তাদের একটি সাধারণ কাঠামো রয়েছে। কিছু কিছু কীটের দেহ বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত থাকে, যেমন: কেঁচো। চ্যাপ্টাকৃমি বা গোলকৃমির ক্ষেত্রে এরকমটি দেখা যায়না। কেঁচোর মতো বেশিরভাগ দেহখণ্ড যুক্ত কীটগুলো স্যাঁতসেঁতে মাটিতে বাস করে। আবার, কিছু কীট জলজ পরিবেশে বাস করতে পারে, যেমন: জোঁক। জেলিফিশ এবং প্রবাল নিডারিয়া (Cnidaria) শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। তাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কোষ রয়েছে, যা তারা মাছ এবং অন্যান্য জীবকে ধরতে ব্যবহার করে। হাইড্রা (Hydra) এবং সামুদ্রিক অ্যানিমোনগুলিও (Anemone) নিডারিয়া শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। স্পঙ্গ (Sponge)

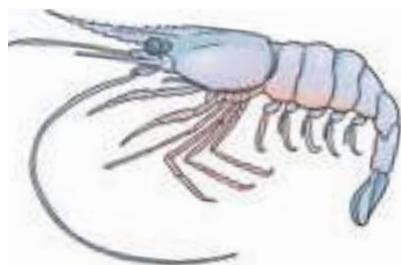
পরিফেরা (Porifera) পর্বের অন্তর্গত। তারা বিভিন্ন রঙের হয়ে থাকে। স্পঞ্জগুলো সমুদ্রের তলদেশে নিজেদেরকে সংযুক্ত করে এবং পানি থেকে ছোট ছোট কণা গ্রহণ করে। বিনুক এবং শামুক মলাক্ষা (Mullusk) পর্বের অন্তর্ভুক্ত। বেশিরভাগ মলাক্ষা পর্বভুক্ত প্রাণী জলে বাস করে। কিন্তু কিছু প্রাণী স্থলেও বাস করে, যেমন—শামুক।

আর্থোপড

আর্থোপড হলো অমেরুন্দণ্ডী প্রাণী, যাদের বহিঃকঙ্কাল (Exoskeleton) শক্ত প্রকৃতির এবং অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলিকে রক্ষায় কাজ করে। বহিঃকঙ্কাল প্রাণীর বৃদ্ধির সাথে বৃদ্ধি পায় না; ফলে প্রাণীর বেড়ে ওঠার সাথে সাথে এটিকে অবশ্যই দেহ থেকে মুক্ত করে দিতে হয়। আর্থোপডদেরও সন্ধিযুক্ত পা থাকে যা তাদের চলাফেরা করতে সাহায্য করে। তাদের দেহ কয়েকটি বিশেষ খণ্ডে বিভক্ত থাকে। আর্থোপডের তিনটি বৃহত্তম গ্রুপ হলো ক্রাস্টাসিয়ান (Crustaceans), কীটপতঙ্গ (Insects) এবং অ্যারাকনিড (Arachnids)। ক্রাস্টাসিয়ানরা মিঠা জলে বা মোনা জলে কিংবা মাটিতে বাস করে। অ্যারাকনিডরাই সম্ভবত প্রথম প্রাণী যারা মাটিতে বাস করা শুরু করেছিল।

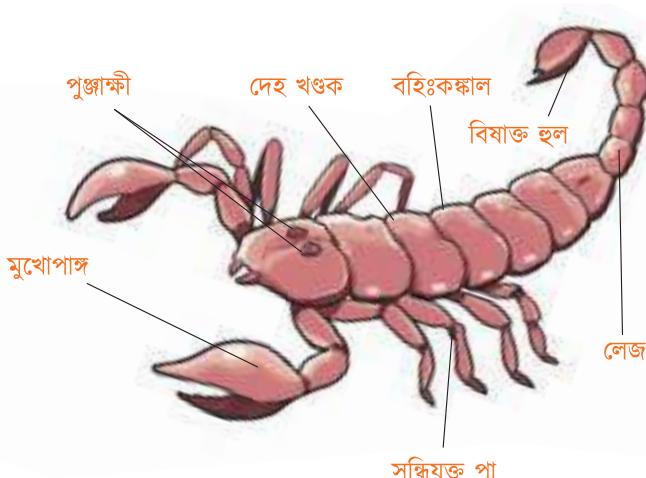
ক্রাস্টাসিয়ান:

কাঁকড়া, চিংড়ি এবং লবস্টার ক্রাস্টাসিয়ানের উদাহরণ।
ক্রাস্টাসিয়ানদের ৩০,০০০ টিরও বেশি পরিচিত প্রজাতি
রয়েছে। সমুদ্রে এদের সবচেয়ে বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়।



কীটপতঙ্গ বা ইনসেক্ট:

আর্থোপডের বৃহত্তম দল হলো
কীটপতঙ্গ, যাদের মধ্যে ১০ লক্ষেরও বেশি প্রজাতি রয়েছে। ইনসেক্ট
গ্রুপের প্রাণীরা মস্তিষ্ক, বক্ষ এবং উদর এই তিনি খণ্ডে বিভক্ত থাকে।
তিনি জোড়া পা এদের বক্ষের
সাথে যুক্ত থাকে। অ্যান্টেনা
এবং চোখ কীটপতঙ্গকে তার
আশেপাশের পরিবেশ বুঝাতে
সাহায্য করে।



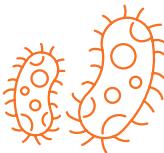
অ্যারাকনিড:

অ্যারাকনিডের মধ্যে রয়েছে
মাকড়সা, টিক, বিছা এবং মাইট
(উকুন জাতীয় প্রাণী)। তাদের
চার জোড়া উপাঙ্গ, একটি বা দুটি



দেহ খণ্ড আছে। এদের কোনো অ্যাটেনা নেই। মাকড়সা এক ধরনের শিকারী প্রাণী যারা প্রধানত কীটপতঙ্গ খাওয়ার উপর নির্ভরশীল। সকল মাকড়সা শক্তিশালী রেশম ফাইবার উৎপাদন করে। কিছু মাকড়সা এই রেশমের জাল বুনে শিকার ধরে থাকে।

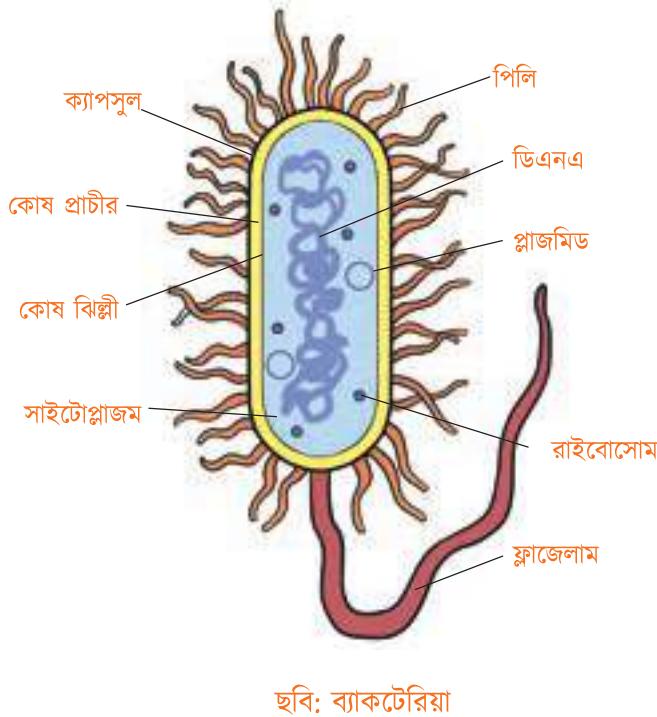
অণুজীব



খালি চোখে দেখা যায়না এমন জীবন্ত বস্তু হলো অণুজীব। অণুজীবগুলো এককোষী হতে পারে অর্থাৎ যাদের শুধু একটি কোষ আছে। কিছু অণুজীব বহুকোষী, যার একাধিক কোষ থাকে। অণুজীবদের জন্য খাদ্য, বায়ু, পানি, বর্জ্য নিষ্পত্তির উপায় এবং তারা বসবাস করতে পারে এমন পরিবেশ প্রয়োজন। কিছু অণুজীব উৎপাদক (Producer) অর্থাৎ সূর্যালোক ব্যবহার করে সরল পদার্থ থেকে নিজেদের খাদ্য তৈরি করে (উক্তিদের মতো)। কিছু অণুজীব পরজীবী/ভোক্তা (consumer), যারা নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারেনা এবং খাদ্যের জন্য অন্যান্য জীবের উপর নির্ভরশীল। বেশিরভাগ অণুজীব রোগ সৃষ্টি করে না বরং অনেক অণুজীব সহায়ক হিসেবে কাজ করে। অণুজীব বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। বিজ্ঞানীরা উক্তিদ এবং প্রাণীদের মতোই অণুজীবদের শ্রেণিবিন্যাস করেছেন। এই শ্রেণিবিন্যাসগুলো অণুজীবের আকার, গঠন, খাদ্যের উৎস, বাসস্থান, এবং চলাচল দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই অণুজীবের মধ্যে রয়েছে ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক এবং প্রোটিস্ট।

ব্যাকটেরিয়া

ব্যাকটেরিয়া হলো পৃথিবীর সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় এবং সুপ্রচুর জীবগোষ্ঠী। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ ব্যাকটেরিয়া সম্পর্কে জানত না। সম্পদশ শতাব্দীর শেষার্ধে অ্যাটেনি ভন লিউয়েনহুক, একজন ডাচ বণিক তার দাঁতের স্ন্যাপিং পর্যবেক্ষণ করতে একটি সাধারণ অণুবীক্ষণযন্ত্র (মাইক্রোস্কোপ) ব্যবহার করেছিলেন। লিউয়েনহুক জানতেন না যে, তিনি যে ক্ষুদ্র জীবগুলি দেখেছিলেন তা ব্যাকটেরিয়া। ২০০ বছর পর এটি প্রমাণিত হয়েছিল যে, ব্যাকটেরিয়ারও জীবন রয়েছে। ব্যাকটেরিয়া প্রায় সকল পরিবেশে বাস করে। এদের সমুদ্র, মাটি এবং প্রাণী এমনকি মানুষের অঙ্গে (ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদান্ত্র) পাওয়া যায়। পৃথিবী পৃষ্ঠের নিচে গভীর শিলাগুলিতেও এদের পাওয়া যায়। জীবাণুমুক্ত করা হয়নি এমন কোনো পৃষ্ঠ ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আবৃত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পৃথিবীতে মোট ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা আশ্চর্যজনক। এটি অনুমান করা হয়েছে পাঁচ মিলিয়ন ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন (পাঁচের পর ত্রিশটি শূন্য!) ! তোমার দেহে কোষের তুলনায় অনেক বেশি ব্যাকটেরিয়া বসবাস করে।



ব্যাকটেরিয়া একটি নির্দিষ্ট আকার পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়, তারপর দ্঵িভাজন প্রক্রিয়ায় প্রজনন করে। এটি ঘটে যখন একটি মাতৃকোষ বিভক্ত হয়ে দুটি অভিন্ন অপত্যকোষ তৈরি করে। এর ফলে খুব দ্রুত ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, আদর্শ পরিবেশে ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা প্রতি ২০ মিনিটে দ্বিগুণ হতে পারে। এই ধরনের দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি একটি অস্থিতিশীল পরিবেশে ব্যাকটেরিয়াকে অভিযোজন করতে সহায়তা করে।

ব্যাকটেরিয়া দুটি রাজ্যে বিভক্ত। ইউব্যাকটেরিয়া এবং আর্কিব্যাকটেরিয়া। ইউব্যাকটেরিয়া বা “প্রকৃত ব্যাকটেরিয়া” প্রায় সব জায়গায় বসবাস করতে পারে, যেমন মাটি, পানি, বায়ু এমনকি তোমার

শরীরেও। আর্কিব্যাকটেরিয়া, অর্থাৎ “আদি ব্যাকটেরিয়া” অনেক প্রতিকূল পরিবেশে বসবাস করতে পারে যেমন উষ্ণ প্রস্তরবণ, সমুদ্রের তলদেশে আঘেয়গিরির জ্বালামুখ এবং অতি লবণাক্ত পরিবেশ। কিছু আর্কিব্যাকটেরিয়াকে তাদের উৎপত্তিস্থলের ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাগ করা হয়। ইউব্যাকটেরিয়াকে আকারের উপর ভিত্তি করে বিভক্ত করা হয়, যেমন—রড, গোলাকার বা সর্পিল আকৃতির। বৃত্তাকার ইউব্যাকটেরিয়াগুলি গুচ্ছ বা দীর্ঘ চেইন আকারে জন্মাতে পারে।

ছত্রাক

ছত্রাক আসলে কী? তুমি কি কখনো রুটির উপর নীলাভ সবুজ কিছু জন্মাতে দেখেছ? এগুলো হলো ছত্রাক। ছত্রাক, ফানজাই (Fungi) (একবচন- ফাঙ্স) রাজ্যের অন্তর্গত জীব। তারা প্রাণী বা উদ্ভিদ নয়। ফলে তারা সালোকসংশ্লেষণ করতে পারে না এবং শোষণের (Absorption) মাধ্যমে খাদ্য গ্রহণ করে। বেশিরভাগ ছত্রাক বহুকোষী, তবে কিছু এককোষী হিসাবে বিদ্যমান। ছত্রাক বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে, যেমন ইস্ট, মোল্ড এবং মাশরুম। ছত্রাকের প্রায় ১.৫ মিলিয়ন প্রজাতি থাকতে পারে। তোমরা সহজেই একটি মাইক্রোস্কোপ ছাড়া রুটির মোল্ড এবং মাশরুম দেখতে পারবে, কিন্তু অধিকাংশ ছত্রাক খালি ঢোকে



দেখতে পাবে না। ছত্রাক নানা পরিবেশে বাস করে যেখানে তোমরা এদের সহজে দেখতে পারবেনা; যেমন, মাটির গভীরে, ক্ষয়প্রাপ্ত গাছের গুঁড়ির নিচে বা গাছপালা অথবা প্রাণীর ভিতরে। কিছু ছত্রাক অন্যান্য ছত্রাকের মধ্যে বা তার উপরে বসবাস করতে পারে। আমাদের পরিবেশের জন্য ছত্রাক খুব প্রয়োজন। ছত্রাক বিভিন্ন পদার্থকে পচিয়ে তা থেকে পুষ্টি উৎপাদন এবং অন্যান্য জীবের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য তৈরি করতে সাহায্য করে। ছত্রাক আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে এবং তারা বিভিন্ন উপায়ে আমাদের জন্য উপকারী।

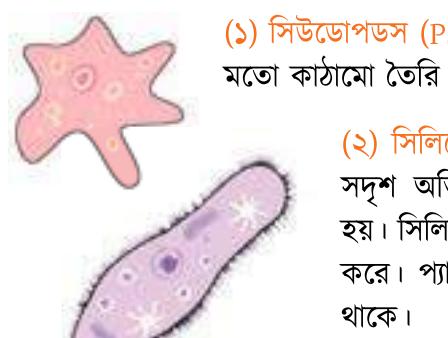
প্রোটিস্ট

এই রাজ্যের জীবগুলো ব্যাকটেরিয়ার ন্যায় এককোষী কিংবা দেখতে অনেক সময় ছত্রাকের মতো। তারা প্রাণীর মতো খাবার খেঁজে বা উত্তিদের মতো সালোকসংশ্লেষণ করে। এত মিল থাকার পরেও ব্যাকটেরিয়া, উত্তিদ কিংবা ছত্রাক কোনোটির সাথেই তাদের মিল পাওয়া যায়না। প্রোটিস্টরা সুকেন্দ্রিক জীবের একটি বৃহৎ এবং বৈচিত্র্যময় শ্রেণি। যেসব সুকেন্দ্রিক জীব এই প্রোটিস্ট রাজ্যটি তৈরি করে, অন্যান্য রাজ্যের প্রাণীদের সাথে তাদের খুব বেশি মিল নেই। তারা তুলনামূলকভাবে সরল প্রকৃতির। প্রোটিস্টরা গঠনগতভাবে একে অপরের থেকে খুব আলাদা। কোনোটি অ্যামিবার মতো ক্ষুদ্র ও এককোষী, আবার কোনোটি সামুদ্রিক শৈবালের মতো বড় এবং বহুকোষী। অবশ্য, উত্তিদের তুলনায় বহুকোষী প্রোটিস্ট গঠনগতভাবে সহজ।

প্রাণী-সদৃশ প্রোটিস্ট

এরা এককোষী সুকেন্দ্রিক জীব (Eukaryote) যাদের মধ্যে প্রাণীর বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। প্রাণীদের মতো এরা চলাফেরা করতে পারে এবং তারা পরতোজী। অর্থাৎ নিজেরা খাদ্য তৈরির পরিবর্তে তারা খাদ্যের জন্য অন্য উৎসের উপর নির্ভরশীল।

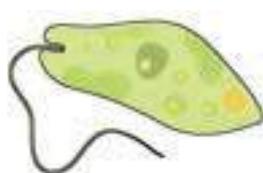
বিভিন্ন ধরনের প্রাণী-সদৃশ প্রোটিস্ট রয়েছে। প্রাণী-সদৃশ প্রোটিস্টদেরকে চলন অঙ্গ এবং চলনের প্রকৃতির ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা হয়েছে:



ছবি: তিন
ধরণের প্রাণী
সদৃশ প্রোটিস্ট

(১) **সিউডোপডস (Pseudopods)** : এদের কোষপৃষ্ঠ প্রসারিত হয়ে অস্থায়ী পায়ের মতো কাঠামো তৈরি করে যা কোষকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

(২) **সিলিয়েট (Ciliate)** : এদের সিলিয়া (Cilia) নামক পাতলা, চুল-সদৃশ অভিক্ষেপ থাকে যা কোষদেহ থেকে বাইরের দিকে প্রসারিত হয়। সিলিয়া সংকোচন-প্রসারণের মাধ্যমে এসব প্রোটিস্ট স্থান পরিবর্তন করে। প্যারামেসিয়াম (Paramecium) সিলিয়ার মাধ্যমে চলাচল করে থাকে।



(৩) **ফ্ল্যাজেলেট (Flagellate)** : এদেরদের লম্বা ফ্ল্যাজেলা (Flagella) থাকে। ফ্ল্যাজেলা পাখার মতো ঘুরে পরিবেশের মধ্য দিয়ে প্রোটিস্টের চলনে সাহায্য করে।

উদ্ভিদ-সদৃশ প্রোটিস্ট

এরা শৈবাল নামে পরিচিত, বড়

এবং বৈচিত্র্যময় একটি শ্রেণি। উডিদের মতো, এই উডিদ-সদৃশ প্রোটিস্টরাও স্বভোজী বা উৎপাদক। অর্থাৎ তারা নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে। উডিদের মতো এরা সুর্যালোকের উপস্থিতিতে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং পানি ব্যবহার করে সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে শর্করা তৈরি করতে পারে। তবে, উডিদের মতো এদের প্রকৃত কাও, মূল বা পাতা নেই। বেশিরভাগ উডিদ-সদৃশ প্রোটিস্টরা সমুদ্র, পুরুর বা হৃদে বাস করে। প্রোটিস্টরা এককোষী বা বহুকোষী হতে পারে।

সামুদ্রিক শৈবাল এবং কেল্প (kelp) বহুকোষী, উডিদ-সদৃশ প্রোটিস্টের উদাহরণ। কেল্প আকারে উডিদের মতো বড় হয়ে সমুদ্রে একটি “বন” তৈরি করে ফেলতে পারে। এ ধরনের প্রোটিস্ট বাস্ততন্ত্রের জন্য অপরিহার্য এবং সামুদ্রিক খাদ্য শৃঙ্খলের ভিত্তি। তারা সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাণীদের শ্বসনের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন তৈরি করে।

ছত্রাক-সদৃশ প্রোটিস্ট

ছত্রাক-সদৃশ প্রোটিস্টগুলোর সাথে ছত্রাকের অনেক বৈশিষ্ট্যের মিল রয়েছে। তারা উভয়ই পরভোজী (Heterotroph), এর মানে হলো এরা নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে অক্ষম। খাদ্যের জন্য তারা অন্য জীবের উপর নির্ভরশীল। ছত্রাকের সাথে এসব প্রোটিস্টের আরো কিছু উল্লেখযোগ্য মিল হলো কোষ প্রাচীরের উপস্থিতি এবং স্পোর ব্যবহার করে প্রজনন। এসব প্রোটিস্টরা সাধারণত চলাচলে অক্ষম, তবে কিছু প্রোটিস্ট পাওয়া গিয়েছে যারা তাদের জীবন চক্রের কোনো এক পর্যায়ে চলাচলে সক্ষমতা অর্জন করে। ছত্রাক সদৃশ প্রোটিস্টের দুটি উদাহরণ হলো—জ্লাইম মোল্ড এবং জলীয় মোল্ড।

শৈবালকে কেন উডিদের
মতো বনে মনে করা থ্যু?

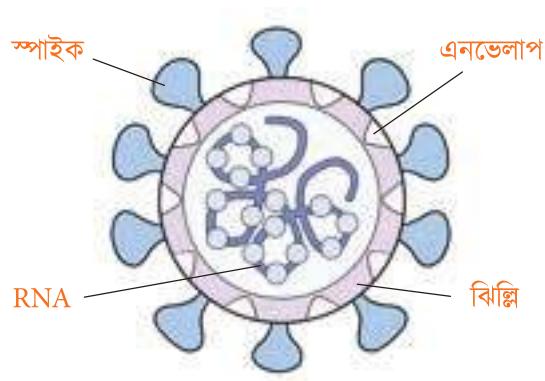


কোরোপ্লাস্টের উপস্থিতি এবং সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা থাকার জন্যই এমন ভাবা হয়। তারপরেও দেখা যায়, শৈবালে প্রকৃত উডিদ কোষের অনেক কিছুই থাকে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, শৈবালের মূল, কাও বা পাতা নেই। কিছু শৈবাল দেখা যায়, যারা আবার চলাফেরা করতে সক্ষম। এরা সিউডোপড (Pseudopod) বা ফ্ল্যাজেলার (Flagella) সাহায্যে চলাফেরা করতে পারে, ফলে উডিদ থেকে বেশ আলাদা হয়ে থাকে। যদিও শৈবাল নিজেরা উডিদ না; এরা সম্ভবত উডিদের পূর্বপুরুষ ছিল।

ভাইরাস

আমরা সবাই এখন SARS-CoV-2 ভাইরাস সম্পর্কে জানি, যেটি COVID-19 এর কারণ। ভাইরাস আসলে কী? ভাইরাস কোনো জীব নয়। তারা কোষ দিয়ে গঠিত নয় এবং তাদের শক্তির উৎস নেই অর্থাৎ ভাইরাস কোনো অণুজীব নয়। ভাইরাস মূলত প্রোটিন আবরণে মোড়ানো জেনেটিক বস্ট- ডিএনএ (DNA) কিংবা আরএনএ (RNA)। এসব অতিক্ষুদ্র জীব বিভিন্ন ধরনের রোগ সৃষ্টি করে থাকে। আমাদের অতি পরিচিত রোগসর্দি-কাশি; এর পেছনেও ভাইরাস দায়ী। ভাইরাসের তো কোনো কোষ

নেই তাই অন্য কোষের মতো এদের কোনো কোষ বিল্লী, সাইটোপ্লাজম কিংবা রাইবোসোম নেই। এখন প্রশ্ন হলো, ভাইরাস কি জীবিত? আমরা জানি সমস্ত জীবের কোষ থাকে; সেই সাথে তারা প্রজননেও সক্ষম। কিন্তু ভাইরাস নিজেরা প্রজনন করতে পারে না। ভাইরাস এমন একটি সত্তা যা অন্য একটি জীবের কোষকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত কোষগুলিকে পোষক (Host) কোষ বলা হয়। জীবকোষে একবার ভাইরাস ঢুকে গেলে, সেটি কোষে তার সংখ্যাবৃদ্ধির নির্দেশ দেয়। তারপর, কোষটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় কিংবা ফেটে ফায় এবং ভাইরাসগুলি মুক্ত হয়। প্রতিটি নতুন ভাইরাস তখন একটি নতুন পোষক কোষ দখল করতে পারে। পোষক কোষ একদিনেই ১০ বিলিয়ন পর্যন্ত অনুরূপ ভাইরাস তৈরি করতে পারে। ভেবে দেখো, ভাইরাস যদি একটি পয়সার সমান হতো! তাহলে একদিনে ১০ বিলিয়ন ভাইরাস পুরো একটা ফুটবল মাঠকে ১ মিটারের বেশি (৩ ফুট) গভীরতায় ভরে ফেলতে পারতো। সংক্রমণের সময় পোষক কোষগুলো ব্যবহার করে তাদের নিজস্ব ডিএনএ (DNA) বা আরএনএ (RNA) অনুলিপি তৈরি করে। ঠিক এই কারণে, বেশিরভাগ বিজ্ঞানী ভাইরাসকে জীবন্ত বস্তু বলে মনে করেন না।



ছবি: SARS-CoV-2 ভাইরাস

অনুশীলনী

?

- ১। ৩৯ নং পৃষ্ঠায় দেখানো প্রাণিগুলোর নাম বলতে পারবে?
- ২। মানুষ ছাড়া আর কোন কোন প্রাণী দুই পায়ে হাঁটে বলো দেখি?
- ৩। খাবার কিছুদিন ফেলে রাখলে, কিংবা ফ্রিজে অনেক বাসী খাবার রয়ে গেলে তার উপর যে সাদাটে ধূসর তুলোর মতো আস্তর পড়ে খেয়াল করেছে? এগুলো আসলে কী বলতে পারো?